অধিকারহারা জনগণের মুখপত্র

জাতীয় বার্তা

সত্য অন্বেষণে নিবেদিত

১ম বর্ষ ‖ ৩য় সংখ্যা ‖ ২১ মার্চ ২০১০ ‖ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ ‖ শুভেচ্ছা মূল্য: ৫ টাকা

email: jatyabarta.jumma@gmail.com

সওয়াল জবাব

"সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে এখানে অশান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। সেনাবাহিনী স্থায়ীভাবে থাকলে এ ধরনের ঘটনা ঘটত না।" বাঘাইহাট ও খাগড়াছড়ি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন শেষে ১৫ মার্চ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে সাংবাদিকদের কাছে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ জয়নুল আবেদীন ফারুক এর মন্তব্য। ১৬ মার্চ-এর কালের কণ্ঠ ও অন্যান্য দৈনিক পত্রিকা।

- কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্তব্য আর কাকে বলে! ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ি পরিবারগুলোর সাথে এ এক নির্মম রসিকতা।

হামলাকারীদের রক্ষার চেষ্টা চলছে

ঘটনার পর এক মাস পেরিয়ে গেলেও সরকার এখনো বিচার বিভাগীয় কিংবা গণ তদন্ত কমিটি গঠন করেনি। অন্যদিকে সাজেক ও খাগড়াছড়িতে হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনেও কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সাজেকে ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িরা এখনো বনে বাদাড়ে ও খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগে ঘর নির্মাণ করতে না পারলে তাদেরকে সীমাহীন কষ্ট ও দুর্ভোগ পোহাতে হবে। অথচ সরকার একেবারে নির্বিকার। আইন প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় কমিটির কয়েক জন সদস্যকে এলাকায় সফরে পাঠিয়েই যেন সরকার তার দায়িত্ব খালাস করেছে।

অন্যদিকে হামলায় জড়িতদের গ্রেফতারেও সরকারের নেই কোন তৎপরতা। বরং উল্টোটাই করছে সরকার। অপরাধী সেনা সদস্য ও সেটলারদের রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে। সাজেকে এত বড় ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হলো, শত শত মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হলো, মানুষ মারা গেলো, অথচ আজ পর্যন্ত দোষী সেনা সদস্য বা সেটলার কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তবে গ্রেফতার করা হয়েছে হামলার শিকার নিরীহ পাহাড়িদের। দেশে এ কেমন বিচার?

আর এদিকে খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি বাড়িঘরে পরিকল্পিত হামলার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইউপিডিএফ-এর ওপর দায় চাপানোর জঘন্য চেষ্টা চলছে। এ প্রসঙ্গে ইউপিডিএফ-এর বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে নিরন চাকমা বলেন, "এটা সেনা বাহিনী ও প্রশাসনের নির্লজ্জ মাতলামি - পাগলের প্রলাপ। প্রকাশ্য দিবালোকে হামলা ও আগুন লাগিয়ে দিয়েছে সেটলাররা, সাংবাদিকদেরও পিটিয়ে জখম করেছে তারা, আর দোষ চাপাতে চাইছে ইউপিডিএফ-এর ওপর। আসলে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনই সেটলারদের দিয়ে ইউপিডিএফ-এর ওপর হামলা চালিয়েছে ও পাহাড়িদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।"

খাগড়াছড়ির এক স্কুল শিক্ষকও হামলার সময় জেলা প্রশাসক-এর ভূমিকাকে রহস্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন হামলার জন্য স্বয়ং জেলা প্রশাসক দায়ী। তিনি নিরপেক্ষ নন, তিনি সাম্প্রদায়িক ও পাহাড়ি বিদ্বেষী। তিনি নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল হলে সেটলাররা কখনোই হামলা করতে পারতো না।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইউপিডিএফ-এর ওপর দোষ দিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে এই বলে যে, ইউপিডিএফ ঘটনার দিন লাঠি নিয়ে মিছিল করায় 'গণ্ডগোল' হয়েছে। এ এক উদ্ভট তত্ত্ব। ইউপিডিএফ-এর কর্মিদের মিছিল ছিল পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ। তারা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় পর্যন্ত মিছিল করেছে ও শাপলা চত্বরে সমাবেশ করেছে; ইউপিডিএফ-এর ঐ মিছিলের কারণে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার আশংকা থাকলে প্রশাসক তখনই ব্যবস্থা নিতে পারতেন। পুলিশকে দিয়ে মিছিল বন্ধ করাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ ইউপিডিএফ-এর মিছিলটি ছিল শান্তিপূর্ণ।

প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধ মোল্লারা অনেক সময় ধর্ষণকারীকে শাস্তি দেয়ার বদলে ধর্ষিতাকেই দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিয়ে থাকে। খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোঃ আবদুল্লাহও অশিক্ষিত গ্রাম্য মোল্লাদের মতো আচরণ করে অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার বদলে হামলার শিকার ইউপিডিএফ-কে শাস্তি দিচ্ছেন। তিনি এখন তাদের সভা সমাবেশ করার গণতান্ত্রিক অধিকারও হরণ করেছেন। এর ফলাফল কখনোই শুভ হতে পারে না।

আমেরিকার লস এঞ্জেলেসে সাজেক হামলার প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভে অংশ নেয়া এক পাহাড়ি তরুণী

অবিলম্বে গণতদন্ত কমিটি গঠন কর: সাজেক ও খাগড়াছড়ি ঘুরে আসা প্রতিনিধি দলের সংবাদ সম্মেলন

জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম সাজেক ও খাগড়াছড়ির ঘটনাস্থল ঘুরে এসে ১৪ মার্চ ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, অবিলম্বে তদন্ত কমিটি গঠন করে ১৯-২০ ফেব্রুয়ারী বাঘাইছড়িতে ও ২৩ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়িতে সংঘটিত ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, "সকাল থেকে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত আমরা সেখানে ঘুরে ঘুরে যেসব বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে তা দেখেছি, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাথে কথা বলেছি। ঘটনাস্থলের ৩০০ গজের ভিতর সেনাবাহিনীর একটি ক্যাম্প দেখে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে হামলাকারীরা সেনাবাহিনীর মদদে এ কাজ করেছে।"

খাগড়াছড়ির হামলা সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাতভাইয়া পাড়ায় আর্মস পুলিশ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা প্রথমে গুলি ছুড়ে আতংক সৃষ্টি করে। গুলির শব্দে ভয় পেয়ে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণ বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। এ সময় এক শ্রেণীর বাঙালি সেটেলাররা এপিবিএন-এর মদদে বাড়িগুলো লুটপাট করে ও পরে আগুন দেয়।"

তিনি সেনাশাসন প্রত্যাহার, অপারেশন উত্তরণ বন্ধ, ঘটনার সাথে জড়িত সেনা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বিচার, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও সেটলারদের সমতলে পুনর্বাসনের দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতির নয়া সেতুর নিত্যানন্দ পাল ও সেড এর পার্থ শংকর শাহা।

সাজেক ও খাগড়াছড়ি হামলার প্রতিবাদে ঢাকায় আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

সাজেক ও খাগড়াছড়ি হামলার ওপর স্থির চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করেছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্র ঐক্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ক্যাফের সামনে ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত উক্ত প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন ঢা.বি'র আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. আকমল হোসেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, ১৯৬০ দশকে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের ওপর নির্যাতন শুরু হয়, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। তিনি জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে পাহাড় ও সমতলে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের ওপর জোর দেন।

প্রদর্শনীতে মোট ১০৯টি ছবি স্থান পায়। এর মধ্যে ৩৬টি সাজেক হামলার একদিন পর তোলা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও মানুষের ছবি। তাছাড়া হামলার বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে আয়োজিত প্রতিবাদ বিক্ষোভের ছবিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রদর্শিত ছবিগুলো দেখার জন্য দর্শনার্থীদের ভিড় জমে। অনেক দর্শনার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন ও দাবির পক্ষে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে মন্তব্য বইয়ে স্বাক্ষর করেন।

বিএনপি চীফ হুইপ-এর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে দুই সংগঠন

১৬ মার্চ মঙ্গলবার সংবাদ পত্রে দেয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক জ্ঞানেন্দু চাকমা ও সাজেক নারী সমাজের আহ্বায়ক অম্বিকা চাকমা সাজেক হামলা সম্পর্কে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ জয়নাল আবেদীন ফারুকের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, "হামলায় সেনাবাহিনীর সদস্যদের সরাসরি অংশগ্রহণ ও তাদের গুলিতে দুই ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরও, তিনি কিভাবে বলতে পারেন সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করার কারণে বাঘাইছড়ি ও খাগড়াছড়ির সহিংসতা সংঘটিত হয়েছে?"

বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় সাজেক হামলা তদন্তের জন্য অবিলম্বে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানান।

চুক্তি বাস্তবায়নে সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত: ইউপিডিএফ

ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর সাধারণ সম্পাদক রবি শঙ্কর চাকমা ১৭ ফেব্রুয়ারী এক বিবৃতিতে বলেছেন এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী দীর্ঘ দিন ধরে 'পার্বত্য চুক্তি' সম্পর্কে ইউপিডিএফ-এর অবস্থান ভুলভাবে উপস্থাপন করে আসছে; ফলে এতে অনেকের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত উক্ত চুক্তি সম্পর্কে পার্টির অবস্থান পুনরায় ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

রবি শঙ্কর চাকমা বলেন "আমাদের পার্টির দিক থেকে পার্বত্য চুক্তির যথাযথ সমালোচনা করে তার অন্তর্নিহিত দুর্বল দিকগুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং এই চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে, যা পার্টি এখনও বিশ্বাস করে। তবে সমালোচনা সত্ত্বেও এই চুক্তি বাস্তবায়নের পথে পার্টি কোন দিন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।"

তিনি বলেন সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করে প্রমাণ করুক যে 'পার্বত্য চুক্তির' মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এই চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইউপিডিএফ সরকারকে সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত রয়েছে বলে তিনি পুনরায় আশ্বাস প্রদান করেন।

সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, "নিজেদের স্বাক্ষরিত 'পার্বত্য চুক্তি' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকার অতীতেও আন্তরিক ছিল না, বর্তমানেও আন্তরিক নয়; বরং সরকার বিভিন্ন সময় চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করেছে। অপরদিকে, জনসংহতি সমিতি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য মুখে রক্ত দেয়ার শপথ নিলেও চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারকে বাধ্য করতে কোন সময় কোন ধরনের আন্দোলনে যেতে চায় নি, যদিও এই ধরনের আন্দোলনে ইউপিডিএফ জেএসএস-কে পূর্ণ সমর্থন দেয়ার লিখিত অঙ্গীকার ২০০০ সালে প্রদান করেছে।"

সম্পাদকীয়

১ম বর্ষ ॥ ৩য় সংখ্যা ॥ ২০ মার্চ ২০১০

জনগণের শত্রুদের বিরুদ্ধে সতর্ক হোন!

পরিকল্পনা মত সাজেক-খাগড়াছড়ি ধ্বংসযজ্ঞ সম্পন্ন করে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। ১৬ মার্চ এক প্রশাসনিক বৈঠকে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনহীন কোন দলকে সাংগঠনিক তৎপরতা চালাতে না দেয়ার এবং নিবন্ধনভুক্ত দলসমূহকেও কোন কর্মসূচি গ্রহণের এক সপ্তাহ আগে প্রশাসনের অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খাগড়াছড়ির ডিসি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। পেছনে খুঁটির জোর না থাকলে একজন ডিসি'র পক্ষে সংবিধান পরোয়া না করে এ ধরনের স্বৈরাচারি সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার স্পর্ধা দেখানোর প্রশ্নই উঠে না। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউপিডিএফ-এর কার্যক্রম সুকৌশলে নিষিদ্ধ করে দেয়া, জনগণের সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি খর্ব করা। খাগড়াছড়িতে সন্তু লারমা গ্রুপের কোন কার্যক্রম নেই।

ইতিপূর্বে এডভোকেট শাহ্ আলমের নেতৃত্বাধীন ৫ সদস্যের সরকারি দলীয় টিম সাজেক-খাগড়াছড়িতে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের নামে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে এক পক্ষীয়ভাবে ডিসির বয়ান শুনে। সহিংস ঘটনা তদন্তের ঘোষণা দেয়া হলেও দলটি ক্ষতিগ্রস্তদের কোন কথা শুনতে চায় নি। উপরন্তু হামলার ঘটনা ধামাচাপা দিতে অপ্রাসঙ্গিকভাবে ইউপিডিএফ-এর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ আনে। তার পরে পরেই নীল নক্সা মত মাঠে নামে একটি চিহ্নিত চক্র। নিরপেক্ষতার প্রলেপ দিতে চক্রটি কতিপয় ব্যক্তিকে যুক্ত করে। কিন্তু দলে মার্কা মারা পঙ্কজ ভট্টাচার্য ও বিপ্লব রহমানের মত চিহ্নিত সংস্থার লোক থাকায় তারা সাধারণ মানুষের কাছে ঘেঁষতে পারে নি। এলাকাবাসী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে এ গোষ্ঠীটির ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন, "মানবতাবাদী নাগরিক সমাজ" নাম ধারণ এবং ডিসি'র সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে ইউপিডিএফকে নিষিদ্ধের দাবি তোলায় তাদের আসল রূপ ফাঁস হয়ে পড়ে। সংবাদ সম্মেলনে তারা প্রশ্নের সঠিক উত্তরও দিতে সক্ষম হয় নি।

এ সমস্ত তৎপরতার সমান তালে বিরোধী দলীয় চিফ হুইফ জয়নাল আবেদিনের নেতৃত্বে বিএনপি'র ৫ সংসদ সদস্যদের একটি দল সমীরণ দেওয়ান ও দীপেন দেওয়ানকে সাথে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যায়। সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটি ও সাজেক নারী সমাজ প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে তাদের প্রত্যাখ্যান করে। ঘৃণা প্রকাশ করতে সাজেকে জুতা-স্যান্ডেল টাঙিয়ে দেয়। এ দলটিও পরিকল্পনা মত খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে সংবাদ সম্মেলন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী মোতায়েনের দাবি তোলে। পাহাড়িদের নাম ভাঙিয়ে হীন ব্যক্তি স্বার্থোদ্ধারে নিয়োজিত চিহ্নিত গণশত্রু সমীরণ দেওয়ান ও দীপেন দেওয়ান সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সেনাবাহিনী মোতায়েনে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্বাচিত তিন এমপি এলাকার মানুষের প্রবল দাবি সত্ত্বেও, জাতীয় সংসদে সাজেক-খাগড়াছড়ি ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য তো দেন নি। অধিকন্তু এলাকাবাসীকে অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্কের মধ্যে রেখে সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব-ছাত্র-নারী সমাজের মুখপাত্র গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের জোরালো আহ্বান উপেক্ষা করে ১৭ মার্চ তারা সরকারি দলের সাথে চীন সফরে যান। এলাকার মানুষের দুর্দশা তুলে ধরতে নয়, সরকারের সপক্ষে রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতেই তাদের সফর দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাজেক-খাগড়াছড়ি ধ্বংসযজ্ঞে সেনাবাহিনী-প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন দলের ভূমিকা প্রকাশিত হওয়ায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রবল সমালোচনা ও নিন্দার মুখে পড়েছে সরকার। তা কাটানোর উদ্দেশ্যেই তিন এমপিকে বিদেশ সফরে অন্তর্ভুক্ত করার হয়েছে।

স্মরণ করা যেতে পারে, ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানে প্রবল সমালোচনা আপত্তি সত্ত্বেও আঞ্চলিক পরিষদের বিতর্কিত চেয়ারম্যান সন্তু লারমা অংশ নিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুরস্কার প্রাপ্তিকে গ্রহণযোগ্যতা দিতে সে সময়ে সন্তু লারমার উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল। সাজেক-খাগড়াছড়ি ধ্বংসযজ্ঞ বাইরের দুনিয়ায় যে নিন্দা-ধিক্কারের ঝড় তুলেছে তাকে প্রশমিত করতে তিন এমপিকে দিয়ে বক্তব্য-বিবৃতি দেয়া প্রয়োজন, উচ্চপদস্থ মন্ত্রী-আমলাদের দিয়ে বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন এমপি আর জনগণের মুখপাত্র নন, সরকারি প্রতিনিধি মাত্র। আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ চলছে সরকারের মনোনীত লোকদের দিয়ে। দুঃসময়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে পাশে দাঁড়ানোর মত জনগণের যে অবলম্বন বা সংগঠন রয়েছে, তাকে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যেই সরকার এগুচ্ছে। তাই নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি সংহত করতে সোচ্চার হতে হবে।

একটি ঐতিহাসিক ভুলের সংশোধন

ইসফাক ইলাহী চৌধুরী

পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পুরো জাতি উৎকণ্ঠায় ছিল। আশা ব্যঞ্জক হলো, কর্তৃপক্ষের তড়িৎ পদক্ষেপ ও শান্তিপ্রিয় জনগণ ও উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণের ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়নি।

যদিও পাহাড়ে এখন শান্তি বিরাজ করছে, তথাপি ঘটনাটি পাহাড়ি জনগণ ও বাঙালি সেটলারদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে এক মস্ত বড় আঘাত। সহিংসতার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে সরকারের ব্যর্থতা।

চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারগুলোর কালক্ষেপন ও বিশেষত বিএনপি-নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রকাশ্যে চুক্তির বিরোধীতা আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো ক্রমবর্ধমান হতাশার সাথে লক্ষ্য করেছে। শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতাদের চোখে এটা হলো বিশ্বাসঘাতকতা। চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় তাদের অবস্থান শান্তি প্রক্রিয়ার বিরোধী কট্টরপন্থীদের সমালোচনার মুখে দুর্বল হয়ে পড়ে।

এটা দুঃখজনক যে বাঙালিদের একটি অংশ আদিবাসী জনগণের অধিকারের প্রতি সহানুভূতিশীল নয় এবং তারা "কট্টর" নীতির পক্ষে। এটা কি স্ববিরোধী নয় যে, একদিকে আমরা পাকিস্তানীদের অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক অধীনতার বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় উদযাপন করি, অথচ আমাদেরই দেশে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর ন্যায্য ক্ষোভকে অস্বীকার করতে চাই?

আমাদের দরকার বাঙালি সেটলারদেরকে পুনর্বসানে উৎসাহিত করা। যারা নিজ বাড়িতে অথবা সমতলে ফিরে যেতে চায় তাদেরকে ফিরে যেতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। তাদেরকে শিল্প কারখানায় অথবা সেবামূলক খাতে নিয়োজিত করার জন্য প্রশিক্ষিত করা যেতে পারে। যারা কৃষিতে ফিরে যেতে চায় তাদেরকে বিভিন্ন চর এলাকায় অথবা বঙ্গোপসাগরে সদ্য জেগে ওঠা দ্বীপসমূহে পুনর্বাসন করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের আবির্ভাবের আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের অভিবাসন শুরু হয়। ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি ছিল মাত্র ৯ শতাংশ। গত কয়েক বছরে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ফলে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। যা শুরু হয় বিন্দু বিন্দু করে তা শীঘ্রই বন্যার রূপ নেয়। ১৯৬২ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ কৃষি জমি পানিতে তলিয়ে যায়। ভূমিহীন চাষীদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে সামান্য টাকা দেয়া হয় বটে, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের জন্য কৃষি জমি পাওয়া যায়নি। এভাবে আদিবাসী জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের জীবিকার উৎস হারিয়ে আভ্যন্তরীণ শরণার্থীতে পরিণত হয়।

বর্তমানে জাতীয় প্রেক্ষিতে বিচার করলে কাপ্তাই বাঁধ বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস হিসেবে (সর্বোচ্চ ২২০ মেগাওয়াট) আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা হিসেবে ভাটি এলাকা এবং বিশেষত চট্টগ্রামের জন্য এর গুরুত্ব রয়েছে। সেজন্য সমতলের লোকজন কাপ্তাইকে (বাঁধ) আশির্বাদ বলে গণ্য করলেও পাহাড়ি লোকজন একে দেখে চিরদিনের জন্য তাদের জীবন ধ্বংসকারী হিসেবে।

আমরা কাপ্তাই প্রকল্পটি বাতিল করতে পারি না, যদিও কিছু উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ সেটাই পরামর্শ দিচ্ছেন -- প্রকল্পটি বাতিল করা, বাঁধকে ভেঙে ফেলা আর মালিকদেরকে তাদের জমি ফিরিয়ে দেয়া। তাদের যুক্তি হলো, আদি মালিকদের কাছে ৭৭২ বর্গ কিলোমিটার বিশিষ্ট উর্বর জমি ফিরিয়ে দেয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লাভ প্রকল্পটি দ্বারা বর্তমানে উৎপাদিত ২২০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের ক্ষতিকে পুষিয়ে দেবে। তবে এটা বাস্তবায়নযোগ্য নয়, কারণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হিসেবে কাপ্তাই বাঁধের গুরুত্ব এখনো রয়েছে। তাহলে আমরা আদিবাসী জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য কি করতে পারি?

পাহাড়ে বাঙালিদের ধীর লয়ের অভিবাসন ছাড়াও তথাকথিত গুচ্ছগ্রামে পরিকল্পিতভাবে দরিদ্র বাঙালিদের বসতিস্থাপন করা হয়। এইসব বসতিস্থাপনকারী অভিবাসী বাঙালিদের বিষয়টিই দুই পক্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মারাত্মক বিবাদের উৎস। অভিবাসন ছিল দুই সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও এইচ. এম. এরশাদের এক প্রিয় নীতি (১৯৭৫ - ১৯৮৬)।

যদিও ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র ভূমিহীন লোকজনকে পুনর্বাসন করা ও তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় করা, তথাপি এই অভিবাসন জনভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটায় ও অনেক সামাজিক সমস্যার জন্ম দেয়। গত তিন দশকে এইসব বসতিস্থাপনকারীরা অস্থায়ী শিবিরে শরণার্থীর মতো জীবন যাপন করেছেন। টিকে থাকার জন্য তাদেরকে সরকারী রেশনের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাদের কিছু অংশকে উঁচু পাহাড়ে অথবা গিরি খাতে জমি দেয়া হয়েছে, যেখানে তারা যেতে পারেন না এবং যা অর্থনৈতিকভাবেও লাভজনক নয়। বন্টনের জন্য আদতে কোন জমি অবশিষ্ট ছিল না।

অধিকন্তু, এদের অনেকে চাষা নন; কোনো একজনকে এক খণ্ড জমি দিলেই তিনি কৃষক হয়ে যান না। কৃষির জন্য দরকার পেশাগত প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও কঠিন পরিশ্রম। যতক্ষণ পর্যন্ত নিরখরচা সরকারী রেশন পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করতে সেটলারদের ওপর প্রণোদনা থাকে না।

সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, বিভিন্ন জেলা থেকে এলোপাথারিভাবে লোকজন সংগ্রহ করে তাদেরকে দিয়ে একটি সংঘবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার ধারণা একটা অদ্ভুদ ব্যাপার। গুচ্ছগ্রামের ধারণা এমনকি সমতলেও ব্যর্থ হয়েছে, পাহাড়ের কথা আর কী বলবো। বাংলাদেশের গ্রাম হলো বহু শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা একটি স্বাভাবিক সংঘবদ্ধ সমাজ (community) যেখানে গ্রামবাসীরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সমাজের সাথে বৈবাহিক, বাণিজ্যিক ও বংশানুক্রমিক সম্পর্কে বাঁধা।

শিবিরে লোকজনের মধ্যে সামাজিক বন্ধন নেই; তারা প্রায়শ আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভক্ত ও তাদের সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম নেই বললেই চলে। একমাত্র যে একটি জিনিসের দ্রুত বৃদ্ধি হয় তা হলো জনসংখ্যা। শিবিরের চারদিকে ঘোরাঘুরি করা শিশুদের সংখ্যা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে; অধিকাংশ পরিবারের ৫-৬টি করে ছেলেমেয়ে রয়েছে। বেশী ছেলেমেয়ে থাকার মানে হলো বেশী রেশন পাওয়া; কাজেই ব্যবস্থাটা জনসংখ্যা কমানোর চাইতে বৃদ্ধিকেই উৎসাহিত করে। সেখানে কোন স্কুল নেই বললেই চলে; তবে আছে কওমি মাদ্রাসা ও মসজিদের বিস্তার যাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইসলামিক দাতব্য সংস্থাগুলো অর্থায়ন করে থাকে।

এইসব অভিবাসীরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত অন্যান্য বাঙালিরা মিলে জনমিতির চরিত্র এমন ব্যাপকভাবে পাল্টিয়ে দিয়েছে যে, কোন কোন এলাকায় বাঙালিরা এখন সংখ্যাগুরু; আর পুরো এলাকায় প্রায় ৪৯ শতাংশ। আদিবাসী জনগণ যারা নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের থেকে আলাদা, তারা যেন নিজ ভূমিতেই পরবাসী।

আমাদের যা করা প্রয়োজন তা হলো বাঙালি সেটলারদেরকে ফিরিয়ে এনে তাদের পূর্বপুরুষের জায়গা জমিতে পুনর্বাসন করা। তবে তাদের অধিকাংশ হলেন ভূমিহীন, যাদের বসতভিটা নদী ভাঙনে হারিয়ে গেছে নতুবা চরম দারিদ্র্যের কারণে বিক্রি হয়ে গেছে। অধিকাংশ সেটলার তাদের আদি জায়গায় ফিরে আসতে উৎসাহী। আসলে, অনেকে তাদের গ্রামের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন এবং অনেক সময় সেখানে তাদের আত্মীয় স্বজনের কাছে বেড়াতে যান।

উৎসাহিত করা হলে, বাঙালি সেটলারদের একটি বিরাট অংশ সমতলে ফিরে আসা পছন্দ করবেন। যাদের কোথাও যাওয়ার মত জায়গা নেই তাদেরকে দেশের কোন শিল্পাঞ্চলে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে, এবং তারা সেখানে চাকুরীতে নিয়োজিত হতে পারেন।

দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত লোকজন বলে থাকেন যে, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে যে কারোর বাংলাদেশের যে কোন জায়গায় বসতিস্থাপন করার অধিকার রয়েছে; উপজাতি এলাকাও তা থেকে বাদ নয়। তবে ভুলে গেলে চলবে না যে, পৃথিবী ব্যাপী উপজাতীয় এলাকার ব্যাপারে বিশেষ আইন রয়েছে। সব জায়গায় সরকারগুলো আদিবাসী লোকজনের জীবনধারা রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য বিশেষ আইন কানুন তৈরি করে থাকে।

আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি সংস্কৃতির আক্রমণে আদিবাসী সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ডুবিয়ে দেয়া অনুমোদন করতে পারি না, যেমনভাবে আমরা ভারতীয় অথবা ইংরেজ সংস্কৃতির আক্রমণে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি ভেসে যাক তা চাই না।

যদিও বাংলাদেশে প্রতি বর্গ মাইলে ৮৭৬ জন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ৮৭ জন বাস করে, তথাপি কৃষি জমির ওপর চাপ সমতলে যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামেও তেমন তীব্র। সেজন্য আমাদের স্বীকার করা দরকার যে, সামরিক-নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধিত্ব-বর্জিত সরকারগুলো অতীতে অশুভ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল যা সংশোধন করা এখন দরকার হয়ে পড়েছে।

আমাদের দরকার বাঙালি সেটলারদেরকে পুনর্বসানে উৎসাহিত করা। যারা নিজ বাড়িতে অথবা সমতলে ফিরে যেতে চায় তাদেরকে ফিরে যেতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। তাদেরকে শিল্প কারখানায় অথবা সেবামূলক খাতে নিয়োজিত করার জন্য প্রশিক্ষিত করা যেতে পারে। যারা কৃষিতে ফিরে যেতে চায় তাদেরকে বিভিন্ন চর এলাকায় অথবা বঙ্গোপসাগরে সদ্য জেগে ওঠা দ্বীপসমূহে পুনর্বাসন করা যেতে পারে।

এমনকি আমরা যদি শিবিরে বসবাসকারী লোকদের একটি অংশকেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে তা হবে অতীতে সম্পাদিত একটি ঐতিহাসিক ভুলের সংশোধন। সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির এতটুকু বদান্যতা তিন দশক ধরে লেগে থাকা ক্ষতকে সারানোর ক্ষেত্রে অনেক কাজ দেবে।

এয়ার কমোডর (অবঃ) ইসফাক ইলাহী চৌধুরী হলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির রেজিষ্ট্রার। [ইংরেজী দৈনিক ডেইলী স্টার-এ ১৮ মার্চ প্রকাশিত। অনুবাদ জাতীয় বার্তা]

জেলার আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভায় প্রদত্ত ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) খাগড়াছড়ি জেলা শাখার বক্তব্য

[গত ১৬ মার্চ ২০১০, খাগড়াছড়িতে জেলার আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মত বিনিময় সভায় ইউপিডিএফ-কেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। উক্ত সভায় ইউপিডিএফ-এর পক্ষে কণিকা দেওয়ান যথারীতি উপস্থিত থাকলেও তাকে বক্তব্য দিতে দেয়া হয়নি। এর প্রতিবাদে তিনি সভা কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। তবে তিনি ইউপিডিএফ-এর লিখিত বক্তব্য সভায় উপস্থিত অনেকের হাতে তুলে দেন। পরে সাংবাদিকদেরও তার কপি দেন। জনগণের জানার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করে আমরা তা হুবহু প্রকাশ করলাম, এতে খাগড়াছড়ি হামলায় প্রশাসনের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। সম্পাদক]

আমাদের পার্টি ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টকে আজকের আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মিটিঙে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের বলার অনেক কথা রয়েছে। তবে সংক্ষেপে আমি আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করবো।

১। প্রথমে আমি প্রশ্ন রাখতে চাই খাগড়াছড়িতে কেন আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে? এর উত্তর খুঁজতে হলে একটু পেছনে যেতে হবে। ২০ ফেব্রুয়ারী সাজেকে সেনাবাহিনীর গুলিতে ২ জন মারা যায় ও গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এর প্রতিবাদে আমরা খাগড়াছড়িতে তাৎক্ষণিকভাবে মিছিল সমাবেশ করি। সাধারণত এ ধরনের হামলা হলে লোকজন উত্তেজিত থাকে। কিন্তু আমাদের মিছিল ও সমাবেশ ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। ফলে এদিন জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোন অবনতি হয়নি।

২। এরপর ২১ ফেব্রুয়ারীও খাগড়াছড়ি শহরে মিছিল ও সমাবেশ হয়। জেলার বিভিন্ন থানা থেকে ইউপিডিএফ-এর কর্মী সমর্থক এতে যোগ দেন। দিঘীনালা থেকে আগতরা ফিরে যাওয়ার সময় এই জেলা প্রশাসকের অফিসের অনতিদূরে শাল বাগানের কাছে হামলার শিকার হয়। তাদের বেশ কয়েকজনকে গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করা হয়। প্রশাসন এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। লক্ষীছড়িতেও সাজেক হামলার বিরুদ্ধে আয়োজিত সমাবেশ থেকে ফেরার সময় সেনা-মদদপুষ্ট বোরখা পার্টির সদস্যরা ইউপিডিএফ-এর কর্মী ও সমর্থকদের ওপর হামলা চালায়। এই সব উস্কানিমূলক হামলার পরও ইউপিডিএফ সংযম ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে।

৩। ইউপিডিএফ সাজেক হামলার প্রতিবাদে ২৩ ফেব্রুয়ারী শান্তিপূর্ণ সড়ক অবরোধের ডাক দেয়। প্রথমদিকে অবরোধ ২২ তারিখ পালনের ঘোষণা দেয়া হলেও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে তা একদিন পেছানো হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারী সড়ক অবরোধ সফল করতে গাড়ি মালিক ও শ্রমিকদের সহযোগিতা ছিল প্রশংসনীয়। সে কারণে অবরোধ চলাকালে কোন যান বাহন চলাচল করেনি। শান্তিপূর্ণভাবে অবরোধ পালিত হয়। এটা লক্ষ্য করার মত যে, সেদিন বাস চালক বা কন্ট্রাক্টর কারোর সাথে সংঘর্ষ হয়নি। কোন গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেনি। রীতি মাফিক অবরোধ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে তা ঘোষণা দেবার লক্ষ্যে দুপুরের দিকে আমাদের একটি মিছিল শাপলা চত্বর ঘুরে স্বনির্ভরের দিকে ফিরে আসার সময় নারিকেল বাগানে আকষ্মিকভাবে হামলার শিকার হয়। শান্তিপূর্ণ এই মিছিলে পেছনের দিক থেকেই দুর্বৃত্তরা হামলা করে। এরপরই তারা নারিকেল বাগানে পাহাড়িদের দোকান পাট ও ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর টার্গেট করে হামলা, লুটপাট ও ভাঙচুর চালায়। তারা মহাজন পাড়ায় পাহাড়িদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। এরপরই বিভিন্ন এলাকায় পাহাড়িদের এলাকায় একের পর এক হামলা চলতে থাকে।

৪। কেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলো তার উত্তর আমি দিলাম। এখন আমাদের আরো কয়েকটি প্রশ্ন আছে, যার উত্তর আমরা প্রশাসনের কাছ থেকে পেতে চাই। আমাদের **দ্বিতীয় প্রশ্ন** হলো, কেন ইউপিডিএফ-এর শান্তিপূর্ণ মিছিলে হামলার সময় পুলিশ হামলাকারীদের বাধা দেয়নি, কেন শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ ও মিছিল করার সংবিধান-সম্মত গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে পুলিশ ও প্রশাসন ইউপিডিএফ-কে সহযোগিতা করেনি? **তৃতীয় প্রশ্ন**, যখন মহাজন পাড়া ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে জ্বলতে থাকল, তখন কেন ফায়ার সার্ভিস আগুন নেভাতে যায়নি এবং দাঙ্গাকারীদের কেন পুলিশ গ্রেফতার করেনি? ফায়ার সার্ভিসকে হামলাকারীরা বাধা দিয়েছে বলে পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন যদি তাই হয়, তাহলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়নি?

৫। মহাজন পাড়া জ্বালিয়ে দেয়ার পর প্রথমে ১৪৪ ধারা ও পরে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। এ সময় মাইকিং করে বলা হয় "ইউপিডিএফ কর্তৃক আহূত সড়ক অবরোধের কারণে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে।" এইভাবে ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমনে সংশয় দৃঢ়তর হয়। তাছাড়া এইভাবে ঘটনাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে ঘোষণা দেয়ার মধ্যে প্রশাসনের দুরভিসন্ধিও স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। তাই, আমরা প্রশাসনের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাই, সেটলারদের দ্বারা ইউপিডিএফ-এর শান্তিপূর্ণ মিছিলে অতর্কিতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করার পরও কী উদ্দেশ্যে অযথা ইউপিডিএফকে জড়িয়ে সেদিন মাইকিং করে উক্ত ঘোষণা দেয়া হয়েছে? এই পর্যায়ে আমাদের **চতুর্থ প্রশ্ন** হলো, এই ঘোষণার মাধ্যমে কি হামলাকারীদের আড়াল ও রক্ষা করা হয়নি?

৬। **পঞ্চম প্রশ্ন**, ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইন জারির পর, সেনা-পুলিশ মোতায়েনের পরও কিভাবে সাতভেইয়া পাড়ায় হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটতে পারে? শত শত হামলাকারী কিভাবে দল বেঁধে টহলরত পুলিশ ও সেনা সদস্যদের ফাঁকি দিয়ে এত দূরে গিয়ে হামলা চালাতে পারে? হামলা ও অগ্নিসংযোগের আগে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা গুলি করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে বলে একটি তদন্ত রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে (জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম কর্তৃক সংবাদ সম্মেলনে পঠিত বক্তব্য)। এ সম্পর্কে আমাদের পার্টি প্রশাসনের বক্তব্য জানতে চাই।

৭। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারী সকাল থেকে গণ গ্রেফতার শুরু হয়। খবংপুজ্যাসহ বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি তল্লাশী চালানো হয় এবং পুরুষ লোক

আমরা মনে করি, প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে ও ন্যায়-অন্যায় বিচার করে কাজ করলে খাগড়াছড়ি ও সাজেকে সংঘটিত হামলার ঘটনা অবশ্যই এড়ানো যেত। ঘটনার জন্য প্রশাসন কোন ভাবে তার দায় এড়াতে পারে না।

পাওয়া গেলেই তাকে আটক করা হয়। এ সময় যৌথ বাহিনী দুই নিরীহ ব্যক্তিকে মারধর করে আধমরা অবস্থায় ফেলে রাখে। আমাদের **ষষ্ঠ প্রশ্ন** হলো, কেন নিরীহ পাহাড়িদের গণ গ্রেফতার করা হলো, অপরদিকে, হামলাকারী সেটলারদের গুটি কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হলেও কেন হামলার আসল হোতা ও তাদের গডফাদারদের কেশাগ্রও স্পর্শ করা হয়নি? যে সব পাহাড়িকে গ্রেফতার করা হয়েছে তারা তো কারো বাড়িতে আগুন দিতে যায়নি, কোন ভাঙচুর-লুটপাটও করেনি। দোষ করেছে একজন, আর শাস্তি পায় অন্য জন! এ কেমন বিচার?

৮। সান্ধ্য আইন জারী থাকার সময় টহলরত সেনা সদস্যরা ২৫ ফেব্রুয়ারী রাতে স্বনির্ভরস্থ আমাদের ইউপিডিএফ অফিসে তালা ভেঙে প্রবেশ করে এবং পার্টির বেশ কিছু বইপত্র, ফাইল, ফার্নিচার ইত্যাদি নিয়ে যায়। নিচে এর তালিকা দেয়া হল:

(ক) ইউপিডিএফ-সহ তিন সহযোগী সংগঠনের অফিসে সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র (ফাইল বক্স সহ সম্পূর্ণ নিয়ে যায়) (খ) প্লাস্টিকের চেয়ার ৫/৬টি (গ) স্টাপলার ১টি (ঘ) বইয়ের মধ্যে রয়েছে : (১) পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন সম্পাদিত জীবন আমাদের নয়-১ কপি (২) পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ সম্পাদিত আমি বিদ্রোহী- ১কপি (৩) হিল উইমেন্স ফেডারেশন সম্পাদিত পাহাড়ের রুদ্ধ কণ্ঠ ও কল্পনা চাকমার ডায়েরী ১কপি করে (৪) ফিরে দেখা নির্বাচন-২০০১ স্পাইরাল বাইন্ডিংকৃত বই ৫কপি (৫) ইউপিডিএফ-এর গঠনতন্ত্র (ইংরেজী ও বাংলা সংস্করণ)–১ কপি করে (৬) ইউপিডিএফ-এর গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের উপর পেপার কাটিংয়ের স্পাইরাল বাইন্ডিংকৃত বই-১ কপি (৭) বিভিন্ন সময়ে ইউপিডিএফ-এর প্রচারিত প্রচার পত্রের (লিফলেট ও বুকলেট) বাইন্ডিংকৃত বই- ১কপি (৮) বিশেষ নির্বাচনী বুলেটিন (চ্যালেঞ্জ) বাইন্ডিংকৃত–১ কপি
(৯) পিতৃভূমি বাইন্ডিংকৃত–১ কপি (১০) Then and Now (নতুন দিল্লী ভিত্তিক এশিয়া সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস কর্তৃক প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর একপি রিপোর্ট) ১কপি

আমাদের **সপ্তম প্রশ্ন**, সেনাবাহিনী বা যৌথ বাহিনীর সদস্যদেরকে আমাদের পার্টি অফিসে তল্লাশী চালানোর জন্য সরকারীভাবে লিখিত কোন অনুমতি দেয়া হয়েছে কিনা? যদি দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের পার্টি সদস্যের উপস্থিতিতে তল্লাশী চালানো হয়নি কেন?

৯। সান্ধ্য আইন ও ১৪৪ ধারা তুলে নেয়া হলেও হুমকিমূলক সেনা টহল এখনো অব্যাহত আছে। সভা সমাবেশ ও মিছিল করতে দেয়া হচ্ছে না। জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে। খাগড়াছড়ির নাগরিক সমাজ মানব বন্ধন করতে চাইলে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। হিল উইমেন্স ফেডারেশন ৮ মার্চ ১০০তম আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে র‍্যালী বের করতে চাইলে তাতেও অনুমতি দেয়া হয়নি। গত ১৪ ফেব্রুয়ারী স্বনির্ভর থেকে হ্যান্ড বোই-ও-বার অর্থ সম্পাদক খোকন চাকমাকে পুলিশ আটক করেছে। তার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে কোন ধরনের মামলা ছিল না। ১৪ মার্চ ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় সদস্য ও গত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খাগড়াছড়ি আসনে প্রার্থী উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমার বাড়িতে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তল্লাশী চালায়। আমাদের **অষ্টম প্রশ্ন**, জরুরী অবস্থা ও সান্ধ্য আইন তুলে নেয়ার পরও কেন জনগণের নাগরিক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে ও নিরীহ লোকজনকে ধরপাকড় করা হচ্ছে?

১০। গত ১৩ ফেব্রুয়ারী জনকণ্ঠে "পাহাড়ে ফের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর পাঁয়তারা: ধর্মান্ধ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মদদ" শিরোনামে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে "পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি বিনষ্টে একটি ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটাতে নানামুখী ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে একটি বিশেষ মহল।" এই ষড়যন্ত্রের সাথে কারা জড়িত সে সম্পর্কে রিপোর্টে আরো বলা হয়, "গত কয়েকদিনে দীঘিনালা উপজেলার মারিশ্যা এলাকায় বেশ ক'টি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে খাগড়াছড়ি জেলা শহরের বেশ ক'জন বাঙালী ছাত্র পরিষদ নেতা (জামায়াত শিবির কর্মী), দীঘিনালা এবং বাঘাইহাট ও মারিশ্যার বাঙালী ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। গোপন সূত্রের খবরে জানা যায়, বৈঠকটি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সূতিকাগার খাগড়াছড়িতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটাতে নেতাকর্মীদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনার বৈঠক ছিল।

রিপোর্টে আরো বলা হয়, "বিশেষ মহলের ইঙ্গিতে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সংঘাতে লিপ্ত হতে যে কোন সময়ের জন্য প্রস্তুত রয়েছে ষড়যন্ত্রকারী দলটির ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা। বিরোধপূর্ণ এলাকাগুলোতে ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের নিজ নিজ এলাকায় বিশেষভাবে অবস্থানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জেলার যে ক'টি স্থানে পাহাড়ী বাঙালীদের মাঝে ভূমি বিরোধ আছে এমন কয়েকটি এলাকায় সাধারণ বাঙালীদের ভূমি দখলে নিতে চলছে উদ্বুদ্ধকরণ, (যাতে সংঘাত অনিবার্য)। খালি জায়গায় নতুন বসতিস্থাপন, তুচ্ছ ঘটনা সৃষ্টির মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিতে নিয়োজিত আছে স্থানীয় মানুষকে নিয়ে বিশেষ দল। এভাবেই চলছে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিকল্পনা। যে কোন সময় যে কোন ঘটনাকে পুঁজি করে মুহূর্তের মধ্যেই ভয়াবহ এই দাঙ্গা সৃষ্টিতে প্রস্তুত রয়েছে উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনটির নেতাকর্মী ও সমর্থকরা। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা।" আমাদের **নবম প্রশ্ন**, এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আগাম তথ্য পাওয়ার পরও কেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি? জনগণ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই সব প্রশ্নের জবাব চান।

১১। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের একটি দল সাজেক ও খাগড়াছড়ি সফর করে ঢাকায় ফিরে গিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে। শত চেষ্টা করেও সাজেক ও খাগড়াছড়ি সহিংস ঘটনার সাথে ইউপিডিএফ-এর সংশ্লিষ্টতা প্রমাণে ব্যর্থ হয়ে তদন্তকারী দলটি অপ্রাসঙ্গিকভাবে ইউপিডিএফ-এর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মিথ্যা অভিযোগ হাজির করে। তাদের এই অভিযোগ ঈশপের বাঘ ও মেষ শাবকের গল্পের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

১২। আমরা মনে করি, প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে ও ন্যায়-অন্যায় বিচার করে কাজ করলে খাগড়াছড়ি ও সাজেকে সংঘটিত হামলার ঘটনা অবশ্যই এড়ানো যেত। ঘটনার জন্য প্রশাসন কোন ভাবে তার দায় এড়াতে পারে না।

১৩। জেলায় আগামীতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আমরা কিছু সুপারিশ পেশ করছি:

ক. মহাজন পাড়া, সাতভেইয়া পাড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

খ. ইউপিডিএফ-এর নেতা-কর্মি-সমর্থক ও সাধারণ লোকজনকে গ্রেফতার ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে। জেলায় পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ ও মিছিল করার অধিকার দিতে হবে। হুমকি ও হয়রানিমূলক সেনা টহল ও তল্লাশী বন্ধ করতে হবে।

গ. সাম্প্রদায়িক উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঘ. ২৩ ফেব্রুয়ারী ঘটনার পর খবংপুজ্যাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে আটক নিরীহ পাহাড়িদের অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে।

ঙ. প্রশাসনকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। ধন্যবাদ।

১ম বর্ষ । ৩য় সংখ্যা । ২১ মার্চ ২০১০ । **জাতীয় বার্তা**

সাজেক ও খাগড়াছড়িতে সেনা-সেটলার হামলার প্রতিবাদে বিদেশে প্রতিবাদ অব্যাহত

সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভাস্থ জাতিসংঘে অফিসের সামনে এশিয়া ইন্ডিজিনাস এন্ড ট্রাইবাল পিপলস নেটওয়ার্কের বিক্ষোভ। ১৫ মার্চ ২০১০।

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে Bangladesh Jumma Buddhist Forum এর ব্যানারে ৪ মার্চ বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে ও ৫ মার্চ জাতিসংঘ অফিসের সামনে মৌন প্রতিবাদ।

মিজোরামের চাকমা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের রাজধানী কমলানগরে হাজার হাজার জনতার বিক্ষোভ। ৪ মার্চ ২০১০।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রবাসী পাহাড়িদের বিক্ষোভ। ৬ মার্চ ২০১০।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের রাজধানী লস এঞ্জেলেসে বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল অফিসের সামনে বিক্ষোভ। ৮ মার্চ ২০১০। CHT-American Jumma People`s Association এর আয়োজন করে। তারা ডেপুটি কনসুলেট জেনারেল শামীম আহমেদ-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর ৭-দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপিও পেশ করে।

কানাডার অটোয়ায় বিক্ষোভ। ৮ মার্চ ২০১০। তারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ছাড়াও কানাডার প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেয়। বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন। ড. আদিত্য কুমার দেওয়ান দূতাবাসের লোকজনকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করেন। কানাডা প্রবাসী পাহাড়িরা ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য চাঁদাও সংগ্রহ করেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবিতে লণ্ডনে সমাবেশ

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগামে পাহাড়ি জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবিতে ২৮ ফেব্রুয়ারী লন্ডনের আলতাব আলী পার্কের শহীদ মিনারের পাদদেশে সমাবেশ ও মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে বেশ কয়েকজন পাহাড়ি ও বাঙালি আলতাব আলী পার্কে উপস্থিত হন। কর্মসূচীর শুরুতে প্রারম্ভিক বক্তব্যে মনজুরুল আজিম পলাশ বলেন, আদিবাসীদের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রম রক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সরকারের। অনুষ্ঠান পরিচালনার শুরুতে লিসা গাজী বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা দলমত নির্বিশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে এই কর্মসূচীর আয়োজন করেছি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি বর্ণনা করে Jumma Peoples Network UK এর লাল আমলাই বলেন, গত ১৯ - ২৩ ফেব্রুয়ারী পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির একাধিক স্থানে আদিবাসীদের (পাহাড়ি) উপর আক্রমণের যে ঘটনা ঘটেছে তাতে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। আমলাই জানান হত্যাকান্ডের ঘটনা ছাড়াও পাহাড়িদের তিনটি বৌদ্ধ মন্দির, একটি চার্চ ও দুই শতাধিক বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। হামলাকারীদের ভয়ে হাজার হাজার পাহাড়ি ঘর ছেড়ে জঙ্গলে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। এমনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যালের আব্বাস ফয়েজ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শুরুতে যে ঘটনা ঘটেছিলো তাতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। বাংলাদেশ সরকারের উচিত অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে শান্তি বিনষ্টকারীদের সাজা দেয়া। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে একটি দাবিনামা পাঠ করেন শিরিন লিরা। পাঠ শেষে দাবিনামাটিতে উপস্থিত লোকজনের স্বাক্ষর নেয়া হয়। দাবিনামাটি পরে দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়। রোববারের কর্মসূচীতে বিলেতের বাঙালিদের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবিতে আয়োজিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার শহীদ আলী, সাংবাদিক সৈয়দ আনাস পাশা, সাংস্কৃতিক কর্মি মঞ্জুলিকা জামালী, অনন্ত কাশেম, ঢাবি শিক্ষক শান্তনু মজুমদার, ওয়ার্কার্স পার্টির ওয়ালি রহমান, কমিউনিস্ট পার্টি ও উদীচী শিল্পী গোষ্ঠির হরুন-ওর-রশীদ, গোলাম আকবর মুক্তা, জাসদের সৈয়দ আবুল মনসুর লিলু, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের খালিজা রহমান, শোয়েব চমক, লেখক তাহমিমা আনাম, নাট্যকার মুকুল আহমেদ, সাংস্কৃতিক কর্মি ঋত্বা, সোহেলী, নবনীতা, প্রমুখ।